ইস্পাত পথে

ঋজিৎ দাস

“পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ...............” বিখ্যাত এই কাব্যিক উক্তি আমাদের নিশ্চয় ভাবতে বাধ্য করে যে সুনির্দিষ্ট পথ না থাকলে পথিক তার গন্দব্যে পৌঁছাতে পারে না। আজকের দিনে নিশ্চয় কারও কল্পনায় আসতে পারে না যে রাস্তা নেই, গাড়ী নেই, যোগাযোগর কোন ব্যবস্থা নেই সর্বোপরি রেলপথ নামে কোন কিছু নেই.... ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যদি ফিরে দেখি সেই সুদূর অতীত যখন পথ ছিল না, কিন্তু ছিল পরিব্রাজক। হিউয়েন সাং বিখ্যাত নাম। শুধু নাম শুনে ভারতবর্ষ বা অন্য কিছু অনিশ্চিতের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল ঘর ছেড়ে, পরিবার পরিজন ছেড়ে। তাই অতীতের সেই পুরনো দিনে, সবে জামা কাপড় পরতে শেখা মানুষজন হয়ত তাগিদ অনুভব করেছিল পথ তৈরীর। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সুষ্টভাবে কীভাবে যাওয়া যায় সেটাও নিশ্চয় বাবিয়েছিল। ফলে প্রয়োজন অনিবার্য হল যানবাহনের। গর গাড়ি, নৌকো, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ঘোড়ার পিঠে ঘোড়- সাওয়ারী না জানি আরও কত কী। মানুষ যেতে চাইল এক জায়গা থেকে আর কে জায়গায়। নিশ্চয় গতির প্রয়োজনও অনুভব করেছিল তারা। ফলে, পথ - যানবাহন - যাত্রীর মধ্যে সমন্বয় সাধন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল এক সময়। পথের রকম ফেরে রথের উদ্ভাবন। ফলে সেই পথের উপযোগী উন্নত যান প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল অবশ্যম্ভাবী।

‘পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি..........” শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় পথেরও বিবর্তন হতে শুর হয়েছিল ধীরে ধীরে। জলপথে জলযান, স্থপথে গোরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা পশুর পিঠে আরোহন করে যাতায়াতও পরিবর্তিতত হতে লাগল ধীরে ধীরে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। মোটর গাড়ী আবিষ্কারে যেমন প্রয়োজন হয়ে পড়ল তার উপযোগী পাকা সড়ক, রেল আবিষ্কারেও তেমনই অপরিহার্য হয়ে উঠল পথের রকমফের। গড়ে থা’ক যতো পথ দিয়ে গতায়াত, আমরা এগোই রেল - সড়ক আর লৌহ শকটে।

চৌদ্দ বছরের অভিজাত পরিবারের মেধাবী কিশোর যখন স্কুলে যায়, গু গম্ভীর পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকে প্রায় পুরো নম্বরটাই পেতে হবে বলে অভিভাবকদের অনুশাসনে জেরবার হয়, ঠিক সেই চোদ্দ বছর বয়সে পেটের দায়ে ইংল্যাণ্ডের কিংওয়ার্থ কোলিয়ারিতে সহকারী ফারারম্যানের কাজ নিয়েছিল এক কিশোর। সপ্তাহে মজুরি ছিল মাত্র সাত শিলিং। দারিদ্রের চাপে অভিভাবকের ক্ষমতা ছিল না। তাকে লেখাপড়া শেখাবার। কোলিয়ারির মধ্যে লোহার সমান্তরাল দুটি পাতার উপর দিয়ে শ্রমিকরা ঠেলাগড়ির মতো ঠেলে নিয়ে যেত উৎপাদিত দ্রব্য বা অন্যান্য সাজ - সরঞ্জাম। গল্পে আছে মরা গাছকে নাকি প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর গভীর ভাবনায় জ্যান্ত করা গিয়েছিল। সেই কিশোরের ভাবনায়ও সেছিল কোন যন্ত্রদানব তৈরি করে ঐ সমান্তরাল লোহার পাতের উপর বসিয়ে, তাকে দিয়ে কী চাকাওয়ালা কেলিয়ারির ট্রলিগুলিকে টেনে নেওয়া যায় না? এই কিশোর শ্রমিতের নাম হয়ত অনেকেই জানেন। সে হল জর্জ স্টিফেন্‌সন্‌ (০৭৮১-১৮৪৮)। সেদিনের সেই ভাবনাই এক ধরনের পথের প্রবর্তনকে বিকশিত করেছিল পরবর্তীতে। সেপথ রেলপথ। দুটি সমান্তরাল মসৃণ লোহার লাইনের উপর লোহার চাকার উপর তৈরি এক যন্ত্রদানব। যে নাকি পিছনে সার সার একটার সাথে আর একটা বাক্সের মতো বসান লোহার চাকাওয়া কোচগুলিকে টেনে নিতে যেতে পারে। লোহার পাত থেকে যাতে পড়ে না যায় তার জন্য লোহার চাকার একপাশে লোহার কাঁদা বার করা ছিল। সমান্তরাল লোহার পাতের উপর লোহার চাকার কাঁদা থাকত দুটি

লাইনের ভিতরের দিকে।

চাকার আবিষ্কার এবং তার উন্নয়ন ইতিহাসেবিদরা মনে করেন মানব সভ্যতার বিকাশের পথিকৃৎ। তাই প্রাচানী সব্যতা যেখানে যতটুকু বিকশিত হয়েছিল, 'চাকা (The wheel and axel) তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক শত্তির কাজ করেছিল। যানবাহনের সাথে পথের শত্ত - পোত্ত আর মসৃণতার যেন একটা সম্পর্ক ছিল। প্রাচীনি রোম সভ্যতার দেখা য ায় মাটির পথের উপর একসারি সমান্তরাল পোড়ামাটির আস্তরণ হয়ত চাকার ক্ষতি কম করে গো, ঘোড়া দিয়ে চাকার য ানকে সহজে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাই রেলপথ বিকাশের পথিকৃৎ কি না বলা মুশকিল, তবে লোহার স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে সমান্তরাল পাতের উপর দিয়ে ঘোড়ার টানা যানবাহন চলত এ তথ্য পাওয়া য ায়। এদেশের কোলকাতাতেই তো ঘোড়ার টানা ট্রাম চলেছিল। কিছুকাল আগে সেটা আমার মনে করিয়ে দিতে সখের সেই ঘোড়ায় টানি ট্রামযাত্রা তো অনেকেই নতুন করে দেখলাম। যাইহোক লৌহ পথে বাষ্পীয় যন্ত্রদানবে টানা গাড়ীর সফল যাত্রার সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিল প্রথম যে ব্যত্তি সেই হচ্ছে স্কুলের গণ্ডি না পেরনো জর্জ স্টিফেন্সন্। তারই নির্মিত সেই যন্ত্রদানব তথা রেল - ইঞ্জিন সেই কিংওয়ার্থ খনি এলাকায় নিয়মিত ব্যবহার হতে লাগল। মানীর মান বিশেষত সেই যদি তারই দেশের লোক হয় তো তাকে মর্যাদা দিতে বোধহয় ইংরেজরা সিদ্ধহস্ত। তাই স্টকটন্ থেকে ড ারলিংটন্ রেলপথ নির্মাণের যে প্রস্তাব করা হয় তার জন্যে ইঞ্জিনিয়ান হিসাবে স্টিফেন্সন্কেই নিযুত্ত করা হয়েছিল। ত াহলে দেকা গেল ১৭৫৬ সালে জেমস্ ওয়াটের সফল উদ্ভাবন।বাষ্পীয়শত্তিকে যান্ত্রিকশত্তিতে রূপান্তরিত করার প্রায় ৫৪ বছর পর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে প্রথম সফলতার সাথে ইস্পাত বর্ত্মে যান পরিবহন। যদিও এটা ছিল খনির ক াজের সাথে যুত্ত। তাহলেও বলতে দ্বিধা নেই রেলপথেৰ জন্ম বৃটেনের খনি গহ্বরে।

সনন্দিগ্ধতা তো মানুষ্য জাতির চিরন্তন উত্তরাধিকার। যান্ত্রিক রথ উদ্ভাবনা এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগও ব্যতিত্রম ছিল ন া সমকালে। ফলে, প্রথমাবস্থাতে জেমস্ ওয়াটের উদ্ভাবিত তাপশত্তির প্রয়োগ যন্ত্রদানবের আবিষ্কার এবং তাতে নিয়ে লৌহবর্ত্মে যখন বাষ্পীয় শকটেরর উদ্ভাবন হল, মানুষ সহজেই যে তাকে গ্রহণ করেছিল এমনটা নিয়েই উদ্ভাবনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাষ্পীয় তথা বৈজ্ঞানিক তাঁদের ধ্যান ধারণার বিশিষ্টতা নিয়েই উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব াষ্পীয় শকটের। এদের মধ্যে উল্লেখ করতেই হয় রিচার্ড ট্রেভিথিক্ (১৮০৪), ব্লেনকিন্সপ (১৮১১), উইলিয়াম হেডলেস (১৮১৩) প্রমুখের। আর জর্জ স্টিফেন্সনের কথা তো উল্লেখ হয়েছেই। সুসভ্য ব্রিটিশ এমনিতেই রক্ষণশীল বলে পরিগণিত। তাই সন্দেহ নিরসনে ইংরেজ মহাজনেরা একটা বেশ অভিনব কায়দা করল। ১৮২৯ সানের অক্টবরে 'রেলহিল ট্রায়াল' নামে আজও তা বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। লিভারপুল শহরে সামন্তরাল ইস্পাতের রেলপথ পাতা হয়েছিল। রেলইঞ্জিন উদ্ভাবকদেরর আহ্বান করা হল সেই পথে তাদের নিজ নিজ রেলইঞ্জিন চালিয়ে মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা প্রমাণ করার। যেন একটা বিশাল প্রতিযোগিতা। মহাজনেরা তার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা সবচাইতে ভাল দক্ষতা যে দেখাতে পারবে তাকে পারিতোষিক দেওয়া হবে ৫০০ পাউণ্ড। ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছাল যেন বর্ণময় একটা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। শোনা যায়, কেউ কেউ আবার এ নিয়ে বেটাবেটি ফেলতেও শু হয়েছিল। হাজার হ াজার ইংরেজ নাগরিক উপস্থিত হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা দেখতে। একই পথ একজনের পর একজন করে অতিত্রম করবে চারজন প্রতিযোগীর মধ্যে স্টিফেন্সনের পালা ছিল সবশেষে, চতুর্থস্থানে। প্রতিযোগিতা শেষে দেখা গেল প্রথম তিনজনের রেলইঞ্জিন কোন না কোন কারণে গণ্ডগোল শু করে দিল। কেবলমাত্র স্টিফেন্সনের 'রকেট' গন্তব্যে পৌঁছল দক্ষতার সাথে অক্ষত হাতিয়ার করেই নয়, অবিশ্বাস্য ছিল তার গতিবেগ ঘন্টায় প্রায় ৩৫ মাইল। এই সাফল্যকে হাতিয়ার করেই ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেষ্টার রেলযাত্রার সূচনা হল স্টিফেন্সনের 'রকেট' হচ্ছে যার প্রথম রেলইঞ্জিন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রিভেলিয়ানের মতে, রেলওয়ে হচ্ছে সারা পৃথিবীকে 'ইংলণ্ডের উপহার'। কিন্তু সহজে এবং স াবলীলভাবেই কি সর্বস্তরের মানুষ একে গ্রহণ করেছিল? মোটেই নয়। আগুনের সাহায্যে জলকে বাষ্পীভূত করে তীব্র গতিবেগে ইস্পাত বর্ত্মে যার চলাচল, সেখানে দুর্ঘটনা ও প্রাণ-হারি আশঙ্কা তো থেকেই যায়। ফলে, স্বদেশে ও বিদেশে এইরূপ যানে আরোহন এবং গমনাগমন সবাই ভাল চোখে দেখেনি। কেউবা মত ছিল নিরাপত্তার দিক দিয়ে এইরূপ অগ্নিরথ মানুষ চলাচলের উপযোগী নয়। কেউ বা কার রটিয়ে দিয়েছিল, এইরূপ যানবাহন যে অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করবে তার আশেপাসের সব গর দুধ নাকি টক হয়ে যাবে।

রক্ষণশীল তদানীন্তন ব্রিটিশ নাগরিকদের কেবল দোষ দিয়ে তো লাভ নেই । সেই সময়ে ভাবনায় অস্বাভাবিক গতিযুক্ত যানে আরোহণ যে শঙ্কার বিষয়, তা বালক রবীন্দ্রনাথকেও বিভ্রান্ত করেছিল। পৃথিবীতে রেল শুর প্রায় তেতাল্লিশ বছর আর বাংলায় তার প্রথম যাতায়াতের প্রায় উনিশ বছর পেরিয়ে যাবার পরও ১৮৭৩ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী এগারো বছর নয় মাসের বালক রবীন্দ্রনাথকে ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাবধান - বাণী আজও লিপিবদ্ধ .... "গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নইলে এমন ভয়ঙঙ্কর ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না।" অভিজ্ঞতার নিরিখে এসব যে ভ্রান্ত তা অচিরেই প্রামাণ্যে পরিণত হয়েছিল। না, রেলপথে রেল বারবার চললেও কোন গর দুধ-ই যেমন টক হয়নি তেমনি বালক রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া সতর্কবার্তার কোন বাস্তবতা উপলব্ধি করেননি রবীন্দ্রনাথ। তাই বিমর্ষ হয়ে তিনি লিখে গেছেন "যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখনও কোনও বিপাদের এতটুকু আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।" গতির সাথে বিঘ্নের সম্পর্ক তো নিশ্চয় আছে। তাকে নিয়ে আশঙ্কা ভীত বাঙ্গালীর তো থাকারই কথা। কিন্তু সেউ শঙ্কা নিরসনে প্রাজ্ঞ অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রকাশ করতে হয়েছিল পুস্তিকা ...."বাষ্পীয় রথারোহীদের প্রতি উপদেশ।" ১৮৫৫ সালে অর্থাৎ হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেণ চলার (১৫ আগস্ট, ১৮৫৪) বছরখানেকের মধ্যে " যাহারা কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাহাদের তৎ-সংক্রান্ত বিঘ্ন নিবারণের উপায় প্রদর্শন" --- আলোচনা বাংলার মানুষকে রেলপথের যাতায়াতের শঙ্কাযুক্ত করতে সাহায্য করেছিল বলা যায়। ধীরে ধীরে দেশে বিদেশ বিপদমুক্ত ও আরামদায়ক দ্রতগামী যোগাযোগ ব্যবস্থা যে রেলপরিবহনের এবং তা যে অন্যান্য সাবেক ব্যবস্থার চাইতে সস্তা এ প্রত্যয় মানুষের মধ্যে দানা বাঁধতে শু করেছিল।

নতুন কিছুর উদ্ভাবন এবং তারর প্রয়োগে প্রথম প্রথম একটু বাধাবিপত্তির আগেই। এই তো কম্পুটার নিয়ে প্রতম প্রথম কত বিরোধিতাই দেখলাম ও শুনলাম। এখন আবার তাকে নিয়ে কত মাতামাতি হচ্ছে। রেলপথ নিয়েও ঠিক তেমনি এদেশে বা বিদেশে বাদ - প্রতিবাদ হয়েছে আবার অভিজ্ঞতার নিরিখে মানুষ তাকে অন্তরিকভাবে গ্রহণও করেছে। বিদেশে, মানে ধরা যাক্ ব্রিটেনেই, রেল চালু হবার চবিবশ বছরের মধ্যেই অথাৎ ১৮৫৪ সালে দেখা গেল কিলোমিটারের হিসাবে প্রায় ১৪,৪১০ কি. মি. পথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করেছিল। আর আমাদের দেশেও ঐরকম স্বল্প সময়েই প্রায় সাতাশ বছরের মধ্যে (১৮৫২ - ১৮৮০) রেলপথ ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় ১৪,৭৭৮ কি. মি.। শুধু যে পথ বেড়েছে কিন্তু তার ব্যবহার হয়নি --- এরকমটা ভাবাও বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ কেবলমাত্র দশ বছরের পার্থক্যে বোঝা যায় পতের বিস্তার যেমন হয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ তেমনই তার থেকে আয়ও উঠে এসেছিল ঐরকম দ্বিগুণ। ১৮৭০ সালে এদেশে রেলপথের দৈর্ঘ ছিল ৭৬৭৮ কি.মি., ১৮৮০ তে হল ১৪৭৭৮। যাত্রী পরিবহণ থেকে আয় ছিল ১৮৭০এ ২.০২ কোটি টাকা, ১৮৮০ তে পৌঁছাল ৪.৪৭ কোটিতে। ফলে শুধুমাত্র পণ্য চলাচলের জন্য রেললাইন পাতা এমনটা না ভেবে যাত্রী চলাচল থেকে ও যে মোটা আয় হতে পারে --- রেলপথ নির্মাণে ব্যস্ত রেল কোম্পানিগুলো সেটাই ভাবতে শু করেছিল। মোটা টাকা আয়ের নিশ্চয়তা যদি কেউ পায় তাহলে সে তো তা করতে উৎসাহিত হবেই। এদেশের ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে রেল কোম্পানিগুলো রেলপথ বিস্তারে নেমে পড়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। লর্জ ডালহৌসিকে এজন্য বলা হয় ভারতে রেলের জনক। যে পথে চলবে রেলগাড়ী সেই পথের জমি পেত রেল - কোম্পানি বিনা পয়সায়। সরকারের তরফে নিশ্চয়তা দেওয়া হত --- নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা চার থেকে পাঁচ শতাংশ লাভ পাবার। না হলে ক্ষতিটা সরকার পুষিয়ে দেবে। গরীব গুর্বোদের দেশে স্বল্প মজুরির নির্মাণকর্মীর অভাব ছিল না। বলে দ্রুত মাকড়সার জালের মতো বিস্তারিত হতে লাগল গ্রাম - শহরের উপর দিয়ে সারা ভারতের রেলপথ। বলাই বাহুল্য, লাভের নিশ্চয়তার আশায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে খনিমুখি বা বিশালকার দ্রহ্য আমদানি - রপ্তানির প্রত্যাশায় বন্দরমুখী রেলপথই প্রাধান্য পেয়েছিল প্রথম দিকে, অসংখ্যা কোম্পানী নেমে গিয়েছিল রেলপথ নির্মাণেৰ প্রতিযোগিতায়। ১৮৮৩ সালে শূন্য থেকে শু হয়ে পাঁচ বছর পেরনো আগেই ১৯৯০ সালের মধ্যে এদেশে রেলরাস্তা ছড়িয়ে পড়েছিল ৩৯,৮৬৫ কিলোমিটার।

ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে রেলপথ বিস্তারের জন্য এরকম অপরিমেয় অর্থ খরচ এবং রেল কোম্পানিকে বগ্গাহীন মদত দেওয়া দেশের এমনকী বিদেশের তদানীন্তন বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীও ভালো চোখে দেখেনি। তার কারড়ও নিশ্চয় অস্বীকার করার মতো নয়। তাদের ধারণায় ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে সেচ ব্যবস্থার বিস্তার রেলপথ বিস্তারের চাইতে বেশি

গ্রহণযোগ্য। এরকম বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার এ.টি.কটন, রমেশ চন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অবিস্মরণীয় এক মাসের পথ এক দিনেই যাইতেছে।" নঞর্থক ভাবেই বঙ্কিম এই উন্নয়ণকে "দেশের বড় মঙ্গল" বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর মতে প্রশ্ন এসে যায়, " .... কাহার এত মঙ্গল! হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপয় দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বদলে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?" কয়েকশত বৎসর অতীত ও বর্তমান অর্থনীতিবিদদের অনুসন্ধানে বা দরিদ্র ভারতবাসীদের অভিজ্ঞতায় বঙ্কিমের এ প্রশ্ন যেন চিরন্তনে পরিণত হয়েছে। সত্যিই তো রেলপথ বিস্তারে অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সম্পদ বন্টন তো দ্রুত এবং সহজতর হওয়া উচিৎ ছিল। দেশবাসীর জীবনযাত্রা তাদের অন্ন - বস্ত্র - বাসস্থানের তো অভাব হবার কথা নয়। ফলত দুর্ভিক্ষের স্পর্শও তো তাদের পাবার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা কিন্তু বিপরীত। বড় তিক্ত, অতিব করুণ। সুপ্রকাশ রায়ের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ যা পাওয়া যায় তা হল ----"উনবিংশ শতাব্দীরদ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৪ - ১৯০১ এই সাতচল্লিশ বছরে) বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্য ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।" অথচ রেলপথ প্রবর্তনের পূর্ববর্ত্তী ৫৩ বৎসর সময়কালে (১৮০১-১৮৫৪) এদেশে দুর্ভিক্ষ হবার কারণে মানুষ মারা গেছিল৫০ লক্ষের কম। সখারাম গণেশ দেউস্করের বিশ্লেষণও প্রায় অনুরূপ। "যে সকল প্রদেশে খাল বিলের সংখ্যা অধিক, সে সকল প্রদেশে বিগত দুর্ভিক্ষ সমূহে লোকের কষ্ট, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অতি সামান্যই হইয়াছিল, এ কথাও বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নহে। ১৮৮২খ্রিঃ হইতে ১৮৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণে ও জলাশয়াদির খননে যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল, তাহার অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়, গভর্নমেন্ট ঐ ১৫/১৬ বৎসরের মধ্যে জল - পূর্ত্তের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।" আবার রেলপথ না থাকতে দুভিক্ষের মোকাবিলা করা গুণ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।" আবার রেলপথ না থাকতে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা যে কঠিন সে মন্তব্যও পাওয়াযায় পুরাতন গেজেটিয়ারে। ১৯১০ সালে প্রকাশিত তদানীন্তন কালের ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদাধিকারী, আই.সি.এস.এইচ.ই গ্যারেটসাহেব প্রণীত 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ নদীয়া'তে পাওয়া এক টুকরো মন্তব্য --- "In the 1896-97 famine the supply of food suddenly gave out in this tract, and, in the absence of the railway, which had not then been constructed, the greatest difficulty was experienced in importing enough grain to prevent deaths from starvation. If another famine should unfortunately occur, this line will save the district officer much of the anxiety which his predecessors had to bear." এখানে উল্লেখ প্রয়োজন ১৮৬২ সালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া ১১১ মাইল রেলপথ চালু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অবিভক্ত বিশাল নদীয়াজেলার বেশীরভাগই ছিল রেল পরিবহনের ছোঁয়ার বাইরে। এমনকি জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরও ছিল রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ১৮৯৯ সালে মার্টিন কোম্পানির দৌলতে ছোটরেল চালু হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত অর্থে নদীয়া জেলা, রাজধানী কলকাতার সাতে রেলদ্বারা যুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করে ১৯০৫ সালে। ঐ সময়ে রাণাঘাট থেকে ভগবানগোলা রেলপথ চালু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারখি থেকে। তাই ১৯১০ সালে গ্যারেট সাহেব সম্ভবত এই কারণেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। পুরস্কার, তিরস্কার বা বাদ - প্রতিবাদ যাই ঘটুক না কেন, পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের তাণ্ডে সাহেবদের স্বদেশে বা বিজিত দেশগুলিতে শিল্প বিকাশের দুর্দমনীয় যে গতি তা রুদ্ধ করে, করা সাধ্য! তদানীন্ত নেটিভ ভারতে রেলপথ বিস্তারে জমির অধিগ্রহণ চলতে থাকলে নির্ঝঞ্ঝাটে আর দেশি বেদেশি রেল কোম্পানীগুলি ভারতের গ্রাম - গঞ্জ থেকে বিভিন্ন শহর - বন্দরে দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেবার লোভ দেখিয়ে রেলপথ বিস্তারের ব্যবসায় নেমে পড়েছিল কোমর বেঁধে। দেশিয় রাজারাও পিছিয়ে ছিলেন না। সিন্ধিয়া, গাইকোয়াড়, নিজাম নিজের নিজের রাজ্যে নিজস্ব উদ্যোগে আবার ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য নিয়ে রেলপথ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিল। এক এক রাজ্যের এক এক নিয়ম। যাত্রী ভাড়া বা পণ্য মাসুলের সমন্বয় - সাধন ক্রমে ক্রমে এক বিড়ম্বনায় পরিণত হল। অবশেষে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কমিটির মতামত নিয়ে ভারতে রেলের জাতীয়করণ হয়। স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্তে সারা ভারতে ছোট রেল (ন্যারো গেজ) মাঝারি রেল (মিটার গেজ), বড় রেল (ব্রড গেজ) প্রভৃতি মিলিয়ে মোট রেলপথের পরিমাণ ছিল ৬৫,২১৭ কি. মি.। ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা আর ভারতটা ভাগ হওয়াতে রাজনৈতিক লাভ যাই হোক না কেন, সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হল একদিকে পশ্চিম অঞ্চল অন্যদিকে গোটা পূর্ব ভারত। পশ্চিমের করাচি বন্দর যেমন বারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অন্যদিকে গোটা পূর্ব ভারত। পশ্চিমের করাচি বন্দর যেমন ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হল ঠিক তেমনই গোটা আসাম আর উত্তরবঙ্গ সম্পূর্ণ

রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল বঙ্গের রাজধানী কলকাতার সাথে। ১০,৫২৩ কি.মি. রেলপথ পাকিস্থানে যাওয়াটা বড় কথা নয়, বড় সমস্যা ল যা ছিল হাতের কাছে তা যেন হঠাৎ -ই হারিয়ে গেল। যে পথ দিয়ে রবিঠাকুর গেছেন দার্জিলিং সেই রানাঘাট - বাগুলা - দর্শনা হয়ে পদ্মাপারে দামুকদিয়া। তারপর পদ্মা পেরিয়ে 'সারা' রেলস্টেশন থেকে শিলিগুড়ি । পরে ১৯১৫ সালে সেই সারাতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ দিয়ে দার্জিলিং মেলে করে সরাসরি যেভাবে যাওয়া যেতে উত্তরবঙ্গ বা আসামে তার অঙ্গহানি ঘটে গেল ১৯৪৭ -এ দেশভাগে। একইভাবে করাচি বন্দরে রেলে করে অর্ন্তদেশীয় বাণিজ্যের সুযোগও হারিয়ে গেল স্বাধীন ভারতের। তাইতো স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের Ministry of Information and Broadcasting বিভাগ থেকে প্রকাশিত The Gazetteer of India (March, 1975) তে উল্লেখ করতেই হল It was logical that the political independence of the country should create an urge for self-sufficiency on the part of railways in the technical field. প্রচুর অর্থ ব্যায়ে সেই তথাকথিত "Self – Sufficiency"-এর জন্য স্বাধীনতা - উত্তরকালে আসাম রেল লিংক প্রচেষ্টা করতে হল। ক্ষতটা জোড়া লাগলেও দাগটা যেমন থেকেই গেল অনেকটা বাইপাস সার্জারি করে বিকল্প পথ তৈরী করার মত। সেয যাইহোক বর্তমানে এদেশে মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে আছে দূরত্বের হিসাবে ৬৩,১২২ কি.মি.র বেশি রেলপথ। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ছোট রেল বন্ধ বা পরিত্যক্ত হলেও ২০০৩-এর মার্চের হিসাবে এখন পশ্চিমবাংলার মধ্যে এই ইস্পাতপথ যোগাযোগ রক্ষা করছে ৩,৬৮০ কি.মি.।

এদেশে ইস্পাত পথে লৌহ শকট প্রবর্তনে বাংলার স্থান দ্বিতীয়। ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট। সেই সময় থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭, বাংলার পথ ঘাট - গ্রাম গ্রামান্তরেও ছোট, বড় আর মাঝারি মাপের রেলপথ ছড়ান ছিল বিস্তর। সড়কপথ উন্নয়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় পিছু হঠতে শু করে দেয় ছোট আর মাঝারি মাপের রেলপথগুলি। স্বাধীনতা পূর্বকালে যখন পিচ যুক্ত পাকা সড়কের প্রবর্তন হয়নি। ছোট ছোট রেলপথ ছিল বেশ কিছু। গুত্বও ছিল তাদের অপরিসীম। দ্রুত ও অপ্রতুল বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থার অবর্তমানে পুরানো সেই দিনে এই রেলপথগুলি ছিল বড়ই আদরের। চার - চাকা বা ছ-ছাকার বাস বা লরির প্রবর্তনের সাথে সাথে রেলের একচেটিয়া কারবার ছেদ শুর হল। কলকাতার উপর ছিল ১৯১৭ সাল থেকে ছোট মাপের কালীঘাট - ফলতা ২৬ মাইল রেলপথ। কলকাতাতে যাত্রীবাহী মোটর বাস চালু হয়ে গেল ১৯২২ সালে। দ্রুত তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৫ সালে হয়ে গেল ২৮০টি। সাথে সাথে ঐ ১৯২৪-২৫ সাল থেকে পূর্বের সেই বন্ধুর সড়কপথ নতুনভাবে উতভাসিত হতে শুর করল মসৃণ পিচ ঢালা রাস্তার। সেই পথের চারচক্র যানের গতি দেশের ছোট রেলগাড়ির গতিকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে শু করে দিল। এ ব্যবস্থা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পরেছিল সারা বাংলাতে। ঐ সময় থেকেই পিচ ঢালা পাকা সড়ক পথের বিস্তার এবং তার উপর দিয়ে দ্রুতগামী সড়কযানের চলাচল বিস্তৃত হতে শু করে দেয়। এর ফলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে ছোট ছোট শাখা - রেলওয়ে কোম্পানী এবং সাথে সাথে একেবারে বন্ধ করে দেয়। যেহেতু রেল চলে সময়ের হাত ধরে। গ্রাম - বাংলার পুকুর পাড় দিয়ে বা বাড়ীর উঠোনের ধার দিয়ে সেদিনের সেই ছোট রেলস কু-ঝিক্ ঝিক্ শব্দ করে যখন চলে যেত পুকুর পারের ন্যাংটো খোকাদের উদ্বাহু উচ্ছ্বাদ রেল চলার গতিকে যেন ছন্দময় করে তুলতো। গৃহকোণে নির্বাক গ্রাম্যবধূটি মেপে নিতে পারত দিনের সময়। গৃহকাজের তাড়া বা মন্থরতাকে নির্ধারণ করত নিপুণভাবে। ঘড়ির অভাব মিটত ছোট রেলের চলাচলের জন্য আধুনিকতার ছোঁয়ায় গৃহগোণে স্থান পেয়েছে হয়ত দম দেওয়া একটা দেওয়ালঘড়ি বা টেবিলঘড়ি কিন্তু হারিয়ে গেছে সেই রেলগাড়ী চলাচল। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে (বি.পি.আর), তারকেশ্বর থেকে ত্রিবেণী ৩৩ মঅলি মাঝে দশঘরাকে জংশন করে সেখান থেকে ছোট্ট শাখা জামালপুরগণজ্ঞ ৮ মঅইল চালু হয়েছিল ১৮৯৫ সালের মধ্যেই কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে নীরবে নিভৃতে ১৯৫৫ সালের ২০ মার্চ থেকে। একই ভাবে হাওড়া - শিয়াখালা, সাথে জনাই শাখা ১৮৯৮ সালের মধ্যে পর্যায়ত্রমে চালু হয়ে দীর্ঘ ৭০/ ৭২ বছর নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিয়ে যেন বানপ্রস্থে গেছে ১ জানুয়ারী ১৯৭১ এ। আবার কিছু কিছু পথ দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকার পর বদলেছে বা বদলাতে চলেছে তার রূপ। নদীর নামে রেলপথ ছিল ছোট মাপের বাঁকুড়া - দামোদর - রিভার রেলওয়ে সংক্ষেপে বি.ডি.আর। বিস্তৃত ছিল বাঁকুড়া - ইন্দাস - রায়নগর মোট ৬০ মাইল। কলকাতার ম্যাকলিয়ড কোম্পানির অধীনে ১৯১৭ সাল থেকে ছোট রেলপথে চলে আসছিল এই ছোট রেলপথ। ভারত সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিনে নেয় ১৯৬৭ মার্চে। চলা আর বন্ধ থাকার মধ্য দিয়ে বহু আন্দোলন আর সুপারিশে বড় মাপের রেলপথে উন্নীত হয়ে সম্প্রতি আবার চলতে শু করেছে। একই ব্যাপার হয়েছে হাওড়া - আমতা এককালের ছোট রেলপথের। ১৯৭১ সালে বন্ধ করে দেবার ৩৫ বছর পর এখন বড় মাপের রেলপথে চলছে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী। স্ব

াধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দীর্ঘ ৩৫ বছর লাগল প্রতিশ্রুতি রূপায়নে। সৌভাগ্য আমাদের পাহাড়ের গায়ে গুটি গুটি পায়ে সরীসৃপের আনাগোনার মতো যাতায়াত করে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ছোট রেল। পেয়েছে দেশী - বিদেশী পর্যটকদের ভালবাসার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের তকমা। অপরিবর্তিত তার যাত্রা পথ, শরীর আর স্টেশন - ব াড়িগুলির সৌন্দর্যায়ন ঘটান হয়েছে ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে। শুধুই ওঠার পালায় টিকে আছে এখনও আহমেদপুর- কাটে ায়া (এ.কে), বর্দ্ধমান কাটোয়া (বি.কে)। পূবোক্ত ম্যাকলিয়েড কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ১৯১৭ সাল থেকে চালু ছোট এই রেলপথও ভারত সরকার ১৯৬৭ -তে কিনে নেয়। সাহিত্যিক তারাশঙ্করের স্মৃতিবিজড়িত লাভপুরের উপর দিয়ে এখনও চলছে কোনো রকমে। (৩২+৩২) মাইল বা ১১২ কিমি রেলপথ বন্ধ হবার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন আপনজনেরা। নদীয় ার ছোট রেল শান্তিপুর - কৃষ্ণনগর ১৮৯৯ থেকে চলার শু। ছোটরেল ২০০৪ সালের ১৫ জানুয়ারী থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পুণরায় ১৬ আগস্ট ২০০৪ থেকে চালু হয়। ১৯২৬ থেকে তার সাথে যুক্ত কৃষ্ণনগর - নবদ্বীপ ঘাট (স্বর ূপগণঞ্জ) এখনও যাত্রী টানে বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীমায়াপুর বা নবদ্বীপের জন্য।

পাঁচ - পাঁচটি দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে দিয়ে দূর্বল গতি নিয়ে শতবর্ষ অতিক্রান্ত করেছে এই ছোট রেল, যার লোকায়ত নাম চৈতন্য এক্সপ্রেস। অনাদরে অবহেলায় এখনও টিকে আছে। প্রতিবেদকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষী এই রেলের যাতায় াতের সংখ্যা কমে গেয়ে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতি বিজড়িত বাগআঁচড়ার সন্নিকটে গোবিন্দপুর আর কৃষ্ণনগর মূল স্টেশন ছেড়ে একটু এগিয়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার ‘কৃষ্ণনগর রোড’, রেল স্টেশনগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। অতি স ম্প্রতি ১-১-২০০৪ থেকে আরও দুটি স্টেশন আমঘাটা (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমৃত্যু লুপ্ত বৃদ্ধাবাস এবং ভাগীরথীর শাখা নদী অলকানন্দা তীরের দৃষ্টিনন্দন গঙ্গাবাস মন্দির) ও মহেশ গঞ্জের অপমৃত্যু ঘটতে চলেছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকার বৃদ্ধা - বৃদ্ধা সহ নবীন প্রজন্মের প্রতিবাদ আন্দোলন আর আকুল আবেদনে পূর্ণবহাল হল সড়কপথের ধার ঘেঁসে চলা ছোট রেলপথের ছোট ছোট রেলস্টেশন দুটি। পাহাড়ে বা সমতলে এক রকম ছোট বা মাঝারি রেলপথ বহু আছে যাদের আলে াচনায় আমাদের দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকের ক্লান্তির উদ্রেক না ঘটানোই সমীচীন।

সময়ের হাত ধরে রেলগাড়ি তার নিজস্ব ইস্পাতপথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ এখন নিশ্চিত হতে পেরেছে মন্থর থেকে দ্রুতগতি লাভ করলেও রেল যাত্রা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং আরামদায়ক। পাথেয় (যাত্রী ভাড়া) তালনামূলক ম(ভ ারতের যাত্রীভাড়া নাকি অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। (বিশেষত দৈনিক যাতায়াতের জন্য এককালীন মাসিক বা ত্রৈমা সিক ভাড়া তো যথেষ্ট ভর্তুকিপূর্ণ। ফলে শত বর্ষ ধরে রেলবিহীন এলাকার মানুষজন চেয়ে এসেছে ইস্পাতপথে তার বসতি থেকে যাতায়াত। কেউ বা পেয়েছে কেউ বা নয়। কেন নয়! রেল বলছে চাহিদা মতো কিছু অংশও যদি ইস্পাতপথে এগে াতে হয় তাহলেও প্রয়োজন এক্ষুণি প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা যা যোগার করা প্রায় অসম্ভব। স্বাভাবিক এই উক্তি। ২৫ হাজার কোটি টাকা যদি দেশি বিদেশি ঋণের সুত মেটাতেই বাজেট থেকে খরচ করতে হয় তা হলে ১৯ হাজার কোটি প াওয়াটা শক্তই বটে।

তাই তো শতবর্ষ ধরে সমীক্ষা করেও রেলপথের ঠিকানা পায় না নদীয়ার করিমপুর এলাকার মানুষ। যদিও দীর্ঘ অপেক্ষ ারর পর সমুদ্র - সৈকত দীঘা ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ যুক্ত হয়েছে রেলপথে। তেমনি ঐ কেইদিনে একলাখি আর বালুঘাটের মানুষ রেলপথে যুক্ত হতে পেরেছে একে অপরের সাথে। কিন্তু যোগীঘোপার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নিউ ময়নাগুড়ির সাথে কবে সংযোগ হবে রেলপথের।

শু থেকে সাবেককালে ইস্পাত পথে লৌহবর্ত্মের সার্ধ শতবর্ষ পথ পরিক্রমায় কতও যে পরিবর্তন আর বিবর্তন হয়েয়ে তার অঙ্ক কষতে বসলে হয়ত একটি জটিল সরল অঙ্কে পরিণত হবে। সেই বনের থেকে বেরোলো টিয়ের দুয়ারগুলি কোথায় চ াপা পড়ে গেছে। সেই লাল ইটের তৈরি ছোট্ট করোগেটের টিনের ঘর হচ্ছে হাওড়া স্টেশন আর টিকিট কাউন্টার বলতে এক ফোকরঅলা একটাজানালা -এটা বর্তমান হাওড়া স্টেশনকে দেখলে কল্পনার গল্প হয়ে যেতে পারে। তেমনি শিয়ালদহ স্টেশন মানেই একখানা টিনের ঘর -ভাবনাতেও আনতে বেগ পেতে হয়। মাতলা তীরে বন্দর হতে পারে এই আশায় ক্যা নিং সাহেবের নামকরণে পোর্ট ক্যানিং রেলস্টেশনথেকে কলকাতা রেলপথের কলকাতার রেলস্টেশন নাকি বেলেঘাটা। সেদিনের শিয়ালদহ আর বেলেঘাটা নামে স্টেশনে হাতি, ঘোড়া, গোর গাড়ি স্টেশন যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া আসা করছে ভাবা যায়? অথচ এ ছবি ছিল নির্জলা সত্য। বন্দরের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলেও রেলপথ কিন্তু চালু হয়ে গেল। ফলে, সে

ানারপুর আর চনপাহাটি ১৮৬২ সালের জানুয়ারিতে আর কলিকাতা থেকে ৪৬ কিমি দূরের ক্যানিং, ১৮৬৩ তেই পেয়ে গেল রেলগাড়ী। সেদিনের ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে ধোঁয়াছাড়া ইঞ্জিনটাকে হটিয়ে ধূম্রহীন সিঁড়িবিহীন শৌচালায়শূন্য বৈদ্যুতিকট্রেন - ই.এম.ইউ. জায়গা করে নিল। জনমানবশূন্য স্টেশনগুলোর মধ্যে বেশকিছু বড় রেলস্টেশনে আর কিছু না থাক, একজন করে চর্মকারকে থাকতেই হত। কেননা, সাহেবসুবো থেকে বাঙালি বাবুদের সখের পাদুকার পরিচর্যা যে ভীষণ জরী। সে যাই হোক, আধুনিক শব্দ প্রয়োগের এখনকার রেলব্যবস্থাকে কৌলীন্য দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন শব্দ বিন্যস 'লাইফ লাইন'। শুধু স্থলভাগ নয়, আজ বিশ্বের দরবারে আভিজাত্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে কলকাতার পরে একমাত্র দিল্লীর মেট্রোই অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। বিগত দেড়শ বছরে মানুষ চেয়ে, অথবা না চেয়ে ইস্পাত - পথে লৌহ শকটকে দাঁড় করিয়ে হরেক স্টেশন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। শিক্ষা অর্জনে সাহায্য তথা দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে দূরান্তে যাতায়াতে রেলপথ এখন অবিকল্প। গ্রাম - শহরের যোগসূত্র রক্ষায় রেলের অবদান অনস্বীকার্য।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com